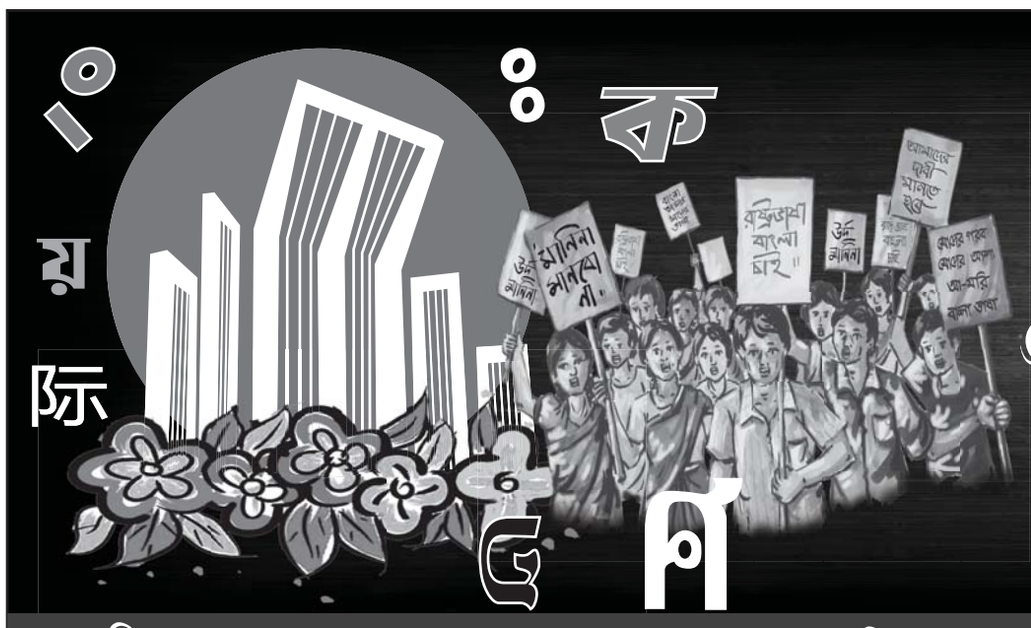

আমর একুশে ২০২৬

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৮ ফাল্গুন ১৪৩২
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাণী

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্মৃতিবিজড়িত এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহীদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহীদদের। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। নিজ মাতৃভাষার অধিকার হরণের এই অন্যায় সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রসমাজসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণ। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আদায় করে নেয় মাতৃভাষার অধিকার। আমাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিলো নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস।

১৯৯৯ সালে শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। জাতি হিসেবে এটা আমাদের অন্যতম গৌরবময় অর্জন। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস।

ভাষা একটি জাতির অস্তিত্ব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। অনেক ত্যাগ ও শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার যথাযথ চর্চা ও মান সংরক্ষণে তাই আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে। উন্নত বিশ্বের সাথে সমানতালে এগিয়ে যেতে বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার ওপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। একটি সমৃদ্ধ জাতি ও টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে– এই প্রত্যাশা করি।

মহান একুশের চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগ্রত হোক, দেশ ও জাতির কল্যাণ নিশ্চিত হোক- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮ ফাল্গুন ১৪৩২
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এই দিনে, আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সকল শহীদকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের এদিনে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে শহীদ হন আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, আব্দুল জব্বারসহ আরও অনেকে তাদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে রচিত হয় শত বছরের শাসন ও শোষণে জর্জরিত তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুক্তির প্রথম সোপান। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার এই আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই করেনি, বরং বাঙালির স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিকে করেছে আরো মজবুত ও সুদৃঢ়। একুশের এই রক্তাক্ত পথ ধরেই মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বাংলা ভাষা আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রধান বাহন, মাতৃভাষার জন্য আমাদের ত্যাগ ও ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। একুশের চেতনা আজ বিশ্বজুড়ে সকল ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও সুরক্ষার আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠাই ছিল একুশের মূল চেতনা। এ চেতনাকে ধারণ করে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম পার হয়ে দেশে আজ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের এই অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ভাষা শহীদ এবং ৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন ও ২০২৪ এর স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধসহ এ যাবৎকালে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সকল শহীদের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি স্বনির্ভর, নিরাপদ, মানবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে চাই।

আজকের এই দিনে আমি বিশ্বজুড়ে সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাই। আসুন, আমরা দেশে বিদ্যমান ভাষাবৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করি, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি সর্বস্তরে বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার ও চর্চা নিশ্চিত করি।

আমি সকল ভাষা শহীদের মাগফিরাত কামনা করি।

আমি মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

তারেক রহমান

ভাষা-আন্দোলনের নাটক 'কবর': রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প

অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম

জাতীয়তাবাদী উপাদান হিসেবে ভাষা-আন্দোলনের গভীর কার্যকরতার এক অব্যবহিত প্রমাণ এই যে, শিল্পকলার জগতে ঘটনাটি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হচ্ছিল আগে থেকেই, আর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরে কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা, গান ও চলচ্চিত্রে বিচিত্রভাবে ওই ঘটনার ছায়া পড়তে থাকে। জাতীয় রাজনীতিতে ঘটনাটি যে খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চুয়ান্নর নির্বাচনের একুশ দফা। ওই নির্বাচনী ইশতেহারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ কয়েকটি দফা ভাষা-আন্দোলনকে ঘিরে রচিত হওয়ায় প্রমাণিত হয়, ঘটনার অনতিবিলম্বে এটি জাতীয় চৈতন্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যে তার যে নানামাত্রিক প্রতিফলন ঘটবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কোনো ঘটনা, ইতিহাস বা রাজনৈতিক তৎপরতার সাহিত্যিক রূপায়ণ সাধারণভাবে কিছু অতিরিক্ত মাত্রা স্পর্শ করে। সাহিত্যে, একদিকে কাঠামোগত বাস্তবতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অন্তরঙ্গ উন্মোচন ঘটে, অন্যদিকে পুরো প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় ভাষার আধারে, যে ভাষা জনগোষ্ঠীর ব্যষ্টিক-সামষ্টিক যাপিত জীবনের প্রধান প্রকাশ। সাহিত্যিক ভাষা তার সামগ্রিক রূপ বা ফর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। রূপের আধারে কাঠামোভুক্ত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের যাপিত জীবনের যে অন্তরঙ্গতা সঞ্চারিত করা সম্ভবপর হয় তা, উদাহরণ হিসেবে বলা যাক, ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে ওঠে। ভাষার যে ব্যঞ্জনা বা বহু-অর্থকতা সাহিত্যের সহজাত, তার ভিত্তিতেই একদিকে জীবনযাপনের অন্তরঙ্গ কোণগুলোতে আলো ফেলা সম্ভবপর হয়, অন্যদিকে বর্তমানময়তার ভাঁজে ভাঁজে এঁকে দেওয়া সম্ভব হয় ভবিষ্যতের ইশারা ও আকাঙ্ক্ষার মানচিত্র।

উল্লিখিত তত্ত্ব-কাঠামোর ভিত্তিতে ভাষা-আন্দোলনের রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের কিছু অন্তরঙ্গ ছবি আমরা অনুসন্ধান করব মুনীর চৌধুরীর 'কবর' (১৯৫৩) নাটকে। রচনাটি নিজ গুণে বহু-পঠিত এবং বিশ্লেষিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পেছনে ক্রিয়াশীল যে জাতীয়তাবাদী গল্প প্রায় সর্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, তার সাপেক্ষে এ টেক্সটের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিশেষ গুরুত্ব আছে। জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে, এখানে উপস্থাপিত ভাষা-আন্দোলন অন্তত মূলধারার বয়ানকে যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বয়ান সাধারণভাবে চলে বেশ উপরিতলে; তুলনামূলক দৃশ্যমান স্তর থেকেই সে তার সুবিধাজনক উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নেয়। সাহিত্যিক ভাষা ও রূপকল্প সাধারণত যাপনের যেসব সূক্ষ্ম স্তরে ক্রিয়াশীল হয়, জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী আখ্যান সে পর্যন্ত পৌঁছাতে চায় না।

'কবর' নাটক রচিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে, ভাষা-আন্দোলনের ঠিক পরের বছর, যখন ঘটনার অব্যবহিত তাপ-ভাঁপ এবং সামষ্টিক মনস্তত্ত্বে জায়মান ঝোঁক ও প্রবণতা বেশ পরিমাণে তাজা ছিল। ষাটের দশকের ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম ও মনোবৃত্তিকে একমুখী করে ঘনীভূত করেছিল, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় তা একেবারেই অভাবনীয় ছিল। এমতাবস্থায় 'কবর' নাটকে ভাষা-আন্দোলনের অব্যবহিত অভিজ্ঞতার এমন ছাঁচ ও প্রবণতা মুদ্রিত হওয়া স্বাভাবিক, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ

ভাষা-আন্দোলনের নাটক 'কবর': রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প

চাপে বিবর্তিত হয়নি। সেদিক থেকে এমনকি তথ্য-উপাত্তের চেয়েও এ টেক্সটের সাক্ষ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা।

সাধারণভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা বলতে আমরা যা বুঝি, 'কবর' নাটকে তার প্রত্যক্ষ হাজিরার সুযোগ সীমিত। তবে গোরস্থানে মঞ্চস্থ দৃশ্যাবলির ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকার সূক্ষ্ম মুনশিয়ানায় একুশে ফেব্রুয়ারির পুরো ঘটনাই সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। কাজেই পরোক্ষভাবে হলেও রাজনৈতিক কর্মসূচি, তার বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচি-বিরোধী রাষ্ট্রপক্ষের ভূমিকা ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। সেখানে রাষ্ট্রপক্ষকে বস্তুত দমন-পীড়নে সিদ্ধহস্ত এক দানব হিসেবেই পাওয়া যায়। হাফিজ যখন বলে, 'কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম।' তখন আসলে এক ভয়ানক নিপীড়ক কাঠামোর দাঁত ও নখর উন্মোচিত হয়। নেতার প্রত্যক্ষ উক্তিতে আর হাফিজের মনোভঙ্গি ও উচ্চারণে রাষ্ট্রপক্ষের এ 'কর্মসূচি' বারবার সামনে এসেছে।

আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি আছে পরোক্ষ বয়ানে- একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার নানামাত্রিক উপস্থাপনায়। তবে প্রত্যক্ষভাবে প্রধানত নেতার সংলাপে নিপীড়িত মানুষের এক তৎপরতার কথা বারবার উচ্চারিত হয়ে প্রায় প্রতীকী মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এর নাম 'মিছিল'। গোরস্থানে হাফিজের মুখে গোলমালের কথা শুনে নেতার তৎক্ষণাৎ মিছিলের কথাই মনে হয়। মিছিলই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একমাত্র ভাষা, যা তার কল্পনায় সহসা ধরা দেয়। হাফিজের কাছে তার জিজ্ঞাসা: 'গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?' তাই তার দিক থেকে দমন-পীড়নের মূল লক্ষ্যও হয়ে দাঁড়ায় মিছিল বন্ধ করা। হেলুসিনেশনে বিবেক-চরিত্রের মতো আবির্ভূত মুর্দা ফকিরের জন্য তার একই দাওয়াই: 'পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো বিশ-পঁচিশ হাত- যত নীচে পারো। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।'

'কবর' নাটক এভাবে মিছিলকে কর্মসূচির এক কার্যকর প্রতীকে পরিণত করে। পাকিস্তান আমলের পরবর্তী দিনগুলোতে এ মিছিলই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক তৎপরতার প্রধান চিহ্ন। আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' (১৯৭৫) বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬) উপন্যাসে, কিংবা শামসুর রাহমানের কবিতায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালে মিছিলের অবিস্মরণীয় আয়োজন আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি আর তৎপরতার এ জাহেরি স্তর ছেড়ে আমরা যদি রাজনৈতিকতার তুলনামূলক বাতেনি স্তরে প্রবেশ করি, তাহলে ভাবাদর্শিক অবস্থান ও বিরোধের নানা মাত্রা দেখতে পাব। বস্তুত, ভাবাদর্শিক পর্যালোচনা থেকেই পৌঁছানো যাবে রাষ্ট্রকল্পে- যে রাষ্ট্র সবসময়, অন্তত আলোচ্য টেক্সটে, ভাবিকালের দিকনির্দেশক।

নেতা যখন বলে, 'গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি।', তখন পরিষ্কার বোঝা যায়, সাতচল্লিশোত্তর পর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো বস্তুত জনপ্রতিনিধিত্বের বাইরে থেকে জনবিচ্ছিন্ন নির্বাহীদের অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। এ রাষ্ট্রকাঠামোই আরও স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়, যখন নেতাকে বলতে শোনা যায়, 'ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটতো না।' বোঝা যায়, কোনো কাঠামোগত স্থিতি নয়, নিয়মতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র বা পুলিশ-প্রশাসন নয়, 'বিশ্বাসী' লোকের 'পেট্রন-ক্লায়েন্ট' সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল। 'আধুনিক' কথাটার যে অর্থই করা হোক না কেন, তার কোনোটার খোপেই এ ধরনের একটা রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্থান হতে পারে না। স্বভাবতই, যে নিয়মতান্ত্রিক অঙ্গ-বিভাজনের উপর আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত, 'কবর' নাটকের বিদ্যমান রাষ্ট্রতন্ত্রে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। একমাত্র এরকম একটা রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেই নেতার পক্ষে বলা সম্ভব: 'টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়ে বেশী ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেবো।' এ উচ্চারণ কেবল এক নীতি-নৈতিকতাহীন বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচয় দেয় না, এমন এক পিছিয়ে-পড়া রাষ্ট্রের কথাও বলে, যে রাষ্ট্র-কাঠামো দলীয় রাজনীতি এবং আইনানুগ নির্বাহীর মধ্যে কোনো ফারাক করতে জানে না।

নেতা চরিত্র প্রণয়নে জিন্নাহর ব্যাপক ছায়াপাত আছে। 'এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না।' নেতার এ সংলাপ স্পষ্টতই ক্ষমতাসীন দলের নেতৃস্থানীয় পদের ইশারা দেয়। অন্যত্র কথাটা বলা হয়েছে আরও খোলাখুলি। কবর থেকে উঠে আসা বেয়াড়া তরুণকে বশীভূত করতে গিয়ে নেতা বলেছে: 'দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে'। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তৎকালীন বাস্তবতায় এ কথা মিমিক্রি এবং ব্যঙ্গের প্রবলতা সত্ত্বেও একমাত্র জিন্নাহর পক্ষেই বলা সম্ভব। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঘটার বহু আগেই জিন্নাহ গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় এ সংলাপ আদতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই কেবল চিহ্নিত করতে পারে। ইতিহাসের জিন্নাহ যেমনই হোক, তাঁর ছায়ায় নির্মিত 'কবর' নাটকের নেতা এক প্রবঞ্চক চরিত্র বৈকি। আর রাষ্ট্রটিও অন্যায্যতার মূর্ত প্রতীক। এখানে নেতা, রাষ্ট্র আর প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করে বেআইনিভাবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ পরিচয় পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে-সাহিত্যে বহুবার নির্মিত হয়েছে। 'কবর' সম্ভবত এর সর্বপ্রাচীন নমুনা। এর বিপরীত রাষ্ট্রমূর্তি এ নাটকে উচ্চকিত হয়েছে মুখ্যত মুর্দা ফকির আর শহিদদের উচ্চারণে। নিশ্চিতভাবে তা এক গণতান্ত্রিক, সহনশীল আর কল্যাণকামী রাষ্ট্র।

এই মুর্দা ফকিরের মাধ্যমেই নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন এ নাটকের সবচেয়ে কার্যকর ভাবাদর্শিক ডিসকোর্স। 'জীবিত' ও 'মৃত' শব্দ দুটির বিদ্যমান অর্থ বদলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজনৈতিকতার এক কাঙ্ক্ষিত সত্য। নেতা ও হাফিজকেই সাব্যস্ত করেছেন মৃত ব্যক্তি বলে, যারা অন্যায়ভাবে বেঁচে থেকে ক্ষমতা-সম্পর্কের উঁচু মোকামগুলোর দখল নিয়ে অনর্থ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, যে মৃতরা কবরে গেছে তাজা বারুদের গন্ধ বুকে ধারণ করে, মুর্দা ফকির বলছে, তারা কিছুতেই কবরে থাকবে না। যতই গোপনে আর গভীরে চালান করা হোক না কেন, ঠিকই উঠে আসবে মাটি ফুঁড়ে, প্রতিষ্ঠা করবে নতুন দিনের নতুন রাষ্ট্র। অন্যভাবে বললে, যে দাবি জনলগ্ন, আর যার উৎপত্তি মানুষের ন্যায্যতার গভীর থেকে, তার ভাবাদর্শিক জোর আর বিস্তারধর্মী বিশিষ্টতা আসলে অপ্রতিরোধ্য। কাজেই আগামীর রাষ্ট্রতন্ত্রে তার সাফল্যও পরম কাঙ্ক্ষিত। 'কবর' নাটকে এভাবে চিত্রিত হয়েছে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া চিন্তাচেতনা। মুর্দা ফকির যে বলেছে, যারা মারা গেছে তারাই বরং জীবিত, তা আসলে বর্তমান জরাজীর্ণ রাষ্ট্রের বিপরীতে সম্ভাব্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই আকাঙ্ক্ষা।

'কবর' নাটকের জন্য রাজনৈতিকতার খুব স্পর্শকাতর এলাকা ছিল ধর্ম। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়- স্পর্শকাতরতার এটাই একমাত্র কারণ নয়। বরং সত্য এই যে, ক্রমশ রাষ্ট্রটি তার প্রায় একমাত্র 'ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাস' হিসেবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় ছদ্ম-আদর্শিকতার এ বর্গটিকে সমস্যায়িত না করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো মর্মগত সমালোচনা দাঁড় করানো আসলে অসম্ভব। অপরদিকে, জনজীবনের ধার্মিকতা এবং ধর্মের 'প্রকৃত' আদর্শিক বয়ান এর ফলে যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হয়েছে।

নাটকের সংলাপে প্রযুক্ত হাস্যরস ও ব্যঙ্গ রাষ্ট্র-ক্ষমতার কুশীলবদের ভালোভাবেই স্পর্শ করেছে। মদ্যপানের কথাই ধরা যাক। স্পষ্টতই, মদ্যপান নাটকটির অন্যতম প্রধান কলা ও কৌশল। এ অর্থে যে, কেবল অবিশ্বাস্য পরিমাণে মদ পান করিয়েই দুজনের সামষ্টিক হেলুসিনেশন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু উপরি হিসেবে ক্রমাগত মদপান অন্য নানা মাত্রাও তৈরি করে। যে রাষ্ট্রের নেতারা ইসলামকে মতাদর্শিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করে রাষ্ট্রশাসন করে, তাদের মদ্যপ দশা নিঃসন্দেহে মঞ্চে এক কমিক আবহ তৈরি করে। পুলিশ-প্রশাসক হিসেবে হাফিজও এর বাইরে থাকে না।

তবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষিত রাষ্ট্রাদর্শটি যে আদতে কপটাচার, সে সত্য তুলে আনতে নাট্যকার মোটেই ইতস্তত করেননি। কাজটা তিনি প্রথমে করেছেন 'অশিক্ষিত' কিন্তু স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞানে স্নাত গোরখোদকদের দিয়ে। তারা প্রশ্ন তুলেছে মৃতের ধর্মীয় কৃত্যের অধিকার নিয়ে। স্পষ্টতই রাষ্ট্রতন্ত্র সে অধিকার দিতে সম্মত ছিল না। তদুপরি এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশিত হয়নি, যাতে মনে হতে পারে, ব্যাপারটাকে তারা গুরুতর মনে করে, তবে পরিস্থিতির কারণে সেদিকে অগ্রসর হতে পারছে না। 'একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।' ইন্সপেক্টর হাফিজের এ প্রস্তাব আর নেতার সোৎসাহ সমর্থন তাদের সে ধর্মনীতিহীন অবস্থানকেই সামনে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, মৃতের সৎকার মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকেরও অন্যতম নির্ণায়ক বর্গ। তবে ওই নাটকে যেমন, তেমনি 'কবর' নাটকেও বর্গটি ধর্মীয় পোশাক ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে নিখিল মানবাধিকারের বর্গে। এভাবে ধর্মীয় বর্গের, বলা যায়, সেক্যুলারায়ন ঘটেছে; আর মানবিকতার নিক্তিতেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রপক্ষের সমালোচনা সম্ভবপর হয়েছে।

এর পরেই সামনে আসে মুর্দা ফকির। চরিত্রটি নিঃসন্দেহে লেখকের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানের প্রতিনিধি এবং বিবেক ধরনের চরিত্র। তার পরিচয় দিতে হাফিজ বলেছে: 'লোকটা এমনিতে ভালো লেখা-পড়া জানে। ভালো আলেম।' মুর্দা ফকিরের পরিচয়ে 'আলেম' শব্দটির প্রয়োগ একেবারেই জরুরি ছিল না। স্পষ্টতই আদর্শিক বুলি হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষের ধর্ম-ব্যবহারের বিপরীতে এই 'আলেম' শব্দটি আরেকটি বর্গ খাড়া করে, যেখানে ধর্মের স্বাভাবিক আদর্শিকতা রক্ষিত হয়েছে, এবং যা মানবিক অবস্থানের রক্ষক। এভাবে তা পরোক্ষে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা করে।

নাটকটির সংলাপে মূর্ত ভাষিক তাৎপর্যের এক মাত্রা এই যে, 'প্রমিত' বাংলা এখানে আধুনিক ও প্রগতিপন্থি তরুণদের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেতা ও হাফিজের ফারসি-আরবি ও সামন্তগন্ধি ভাষার বিপরীতে মুর্দা ফকির ও শহিদ তরুণদের শব্দ আর ভাষারূপ প্রণয়নে ব্যতিক্রমহীনভাবে 'প্রমিত' বাংলার প্রশ্রয় এ তাৎপর্যকে দ্বিধাহীনভাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। হাফিজের দুটি সংলাপ উদ্ধৃত করে শব্দ-ব্যবহার ও ভাষারূপের ভাবাদর্শিক প্রকাশ দেখানো যাক।

বিশ্বাসী লোকের অভাব প্রসঙ্গে নেতার আফসোসের জবাবে হাফিজ বলে: 'সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না।' আবার রাতের এ গোপন মিশনে গার্ডের মতো উটকো লোক নিয়ে আসা ঠিক হয়নি- এ মতের পক্ষে যুক্তি হিসেবে সে বলে: 'তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই।' দুটি সংলাপেই শব্দরূপের বাহ্য অবয়ব খুব স্পষ্ট। কিন্তু গভীর-স্তরে প্রযুক্ত শব্দের সাথে সম্পর্কিত ডিসকোর্স উপস্থিত হয় রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের একেবারে অন্দরমহলের খবরসহ। প্রথম সংলাপের 'নিমক' কথাটাই ধরা যাক। শব্দটি আন্তঃব্যক্তি-সম্পর্কের যে ধরন সাব্যস্ত করে, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক-পূর্ব, আর রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং একজন পুলিশ অফিসারের মুখে ব্যবহৃত হওয়ায় তা খোদ রাষ্ট্রেরই চিহ্নায়ক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় সংলাপের 'বিবি' ও 'বেপর্দা' কথা দুটি সাংস্কৃতিক বার্তায় খুবই ভারাক্রান্ত- অনাধুনিক যদি নাও হয়, মোটেই সর্বজনীন নয়। কিন্তু সংলাপের ভিতর-কাঠামোয় ধৃত সংবাদটি আরো মর্মান্তিক: রাষ্ট্রীয় কাজে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়- এ সংজ্ঞাপন এর লক্ষ্য নয়; লক্ষ্য আসলে এক অবৈধ কর্মযজ্ঞের ব্যাপারে নিজেদেরই স্বীকৃতি। লক্ষণীয়, মৃত তরুণ ও মুর্দা ফকিরের সংলাপে এ ধরনের শব্দ নেই; আর যদি অনুরূপ শব্দ থাকেও, তা কিছুতেই সমরূপ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়নি।

হুমায়ুন আজাদ লক্ষ করেছেন, একুশের অন্যতম প্রধান তাৎপর্য এই যে, এটি বাংলাদেশের বাংলা ভাষাকে পরিস্রুত করেছে। এ বিবৃতি 'ভাষারূপের স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা'র দিক থেকে যতই সমস্যাপূর্ণ হোক না কেন, 'কবর' নাটকের পূর্বোক্ত ভাষা-চৈতন্য আজাদের কথাকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। নাটকে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত গার্ডের সংলাপে ব্যবহৃত কথ্য-আঞ্চলিক বাংলা এক গভীর অপরায়ণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। শুধু বাস্তবতা রক্ষার তাগিদ দিয়ে এ ধরনের ভাষা-নির্বাচনকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, নাগরিক পরিসরে কাজ করা একজন গার্ডের জন্য সরল নাগরিক কথ্য বাংলা বাছাই করা অন্তত কেতাবি শব্দ ও ভঙ্গি বাদ দিয়ে মোটেই অস্বাভাবিক হতো না। কোনো সন্দেহ নাই, গার্ডের সংলাপের জন্য ব্যবহৃত এ ভাষারূপ গৃহীত হয়েছে একদিকে সংলাপে বৈচিত্র্য তৈরির অনুরোধে, অন্যদিকে হাস্যরস সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। নাটকটির রসগত বৈচিত্র্যের জন্য এবং 'কমিক রিলিফে'র জন্য এ নির্বাচন যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। কি